বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা

আমিনুল ইসলাম

মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮০০ হইতে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের অক্লান্ত চেষ্টায় 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় গদ্যরীতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পাশ্চাত্য প্রভাব-দ্বীপ্ত কাব্যধারা যখন পূর্ণ-বিবর্তিত, সবে তখনই বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের এই যে অর্ধশতাব্দীরও অধিককালের বিড়ম্বিত প্রবেশ, ইহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য প্রধানত দায়ী।"

নতুন পরিবর্তনের যুগে আবার একটা দোলাচল অবস্থাও ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে ওঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়, তা ঐতিহাসিক কারণে খ্রিষ্টান পাদরী ও হিন্দু পন্ডিতদের দ্বারা গড়ে ওঠে। তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞান করে ব্যাকরণরীতি ও শব্দমালার দিকে থেকে সংস্কৃতকে বেশি নির্ভর করেন। পন্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা কিরকম মূর্তি লাভ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিযাছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আর্জাই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ...পন্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।"[১] এমন ভাষার প্রতি মুসলমানদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওযা স্বাভাবিক ছিল। তাই মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। আব্দুল লতিফ সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে কোর্ট-কাচারীতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাংলাকে গ্রামের মুসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত দ্বন্দ্বেও অনেকে বিচলিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

বিশ শতকের প্রথমের দিকে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় রাজি ছিল, কিন্তু আপত্তি করলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত, যিনি বেদ-উপনিষদ পড়াতেন। কোনও ম্লেচ্ছকে তিনি বেদ-উপনিষদ পড়াবেন না। কিছুতেই না। কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত পড়া হয়নি। 'The Bengalee' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অবশ্য এতে রেগে তার পত্রিকায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, ওই পন্ডিতকে গঙ্গার 'পবিত্র' জলে নিক্ষেপ করা হোক। তাতে কাজ হয়নি, উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জির চেষ্টাতেও কাজ হয়নি। তবে শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়েছিলেন ঠিকই, তবে সেটা বাংলায় সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়েছিল জার্মানীতে গিয়ে। এমনকি ইংরেজ কর্মচারীদেরও প্রথমের দিকে সংস্কৃত শেখাতে আগ্রহ দেখানো হয়নি। জহরলাল নেহেরু তাঁর 'The Discovery of India' বইতে স্মরণ করেছেন যে, স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), পরে যিনি ভারতবিদ হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে ইউরোপে পরিচিত করতে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা গ্রহণ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে প্রথমে সুবিধা করতে পারেন নি। বিচিত্র ও কঠোর শর্তে এক পন্ডিতের কাছে জোন্স সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। উল্লেখ্য এই জোন্সের উদ্যোগেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ১৭৮৪ সালে।

শূদ্রের জন্য তথা নীচুতলার মানুষদের জন্য সংস্কৃত শেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিখলে, শুনলে বা বললে কানে তরল সীসা ঢেলে দেওয়া, মুখের ভিতর লোহার তপ্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়া, জিভ কেটে নেওয়া প্রভৃতি যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তা রোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য। মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের ও কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—'কৃত্তিবাসে, কাশীদাসে আর বামন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে।' কিন্তু সংস্কৃত পন্ডিতদের এই রক্ষণশীলতা কেন? কিছুটা অবশ্যই সংস্কারবশত। কিন্তু আসল কারণ সংস্কার নয়, স্বার্থ। একই কারণে মুসলিম উর্দু-ঠিকাদারেরা বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও এক সময়ে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিল।

অব্রাহ্মণ তো নয়ই, এমনকি ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাও সংস্কৃত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে অনুমোদন পাননি। ব্রাহ্মণেরা বাংলার চর্চাকে ভাল চোখে দেখেননি। বাংলা ভাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন। যখন বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন, বাংলা চর্চাকারীদের সামাজিক শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে তখন এই ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। ব্যাকরণ ঠিক রইল, কিন্তু অভিধান স্ফীত হল সংস্কৃত শব্দাধিক্যে। এর ইতিহাসটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদের' মোট দু'হাজার শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একশ। শতকরা হিসাবে তা ৫টি। পরবর্তীকালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সংস্কৃত শব্দের বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তখনো শতকরা ১২.৫-কে ছাড়িয়ে যায়নি। তৎসম শব্দ বাড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের

হস্তক্ষেপে। বাড়তে বাড়তে তা শতকরা ৮০-তে এসে দাঁড়ালো। শতকরা ৮০ ভাগ সংস্কৃত শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ইংরাজিতে লেখা বাংলা ভাষার ওপর তাঁর ব্যাকরণ বইতে (১৮১৮ তে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে)। অথচ ওই বইয়েরই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে কেরী মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধু বাংলা যদিও সংস্কৃত থেকেই উদ্ভুত, তবু 'Multitudes of words originally Persian are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered helping rather than corrupting the language.'

১৮ শতকের শেষের দিকে বাংলা ভাষা থেকে কিভাবে আরবি-ফারসি শব্দ দূর করে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হেলহেড এবং পরবর্তীকালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পন্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন;ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যে বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। ...অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ভগবত্‌গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"[১ক]

এ প্রসঙ্গে আমরা আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যও তুলে ধরতে পারি : "অনেকের ধারণা পাদ্রীরাই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের প্রচলন করেন। তাঁরা মনে করেন ইংরাজ আগমনের আগে বাংলা ভাষার লিখিত কোনও গদ্যরূপ ছিল না। ইংরেজ পাদ্রীরাই উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। কথাটা মোটেই সত্য নয়। মুসলিম শাসন আমলে বাংলা গদ্য লেখা সুপ্রচলিত ছিল। এত্তেলানামা দরখাস্ত পরওয়ানা আদালতের আরযি-জবাব-রায় চিঠিপত্র জায়দাদ সম্পর্কিত দলিল তমসুক ও তওলিয়াতনামা হেবানামা দানপত্র ইত্যাদি সমস্তই গদ্য ভাষায় লেখা হইত। ছোটভাই রাধাকৃষ্ণের বরাবরে মহারাজ নন্দকুমারের সতর শ' ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে লিখিত ইতিহাস-বিখ্যাত চিঠি এবং লন্ডন যাদুঘরে রক্ষিত আরও দুই-চারখানা গদ্য লেখা তার প্রমাণ। এইসব দলিল-পত্রে স্বভাবতঃই সুপ্রচলিত আরবী-ফারসীজাত বহু শব্দ ব্যবহার করা হইত। অতএব ইংরাজ পাদ্রীরা উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন, এ কথার অর্থ এই যে, তাঁরা আরবী-

ফারসী শব্দবিবর্জিত সংস্কৃত-শব্দবহুল বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। হিন্দু সুধী সমাজকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার মতলবে এই পাদ্রী ইংরেজীতে বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন। তাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কোন্ কোন্ শব্দ আরবী-ফারসী তা দেখাইয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিত এই সময় সংস্কৃত শব্দ-ভারাক্রান্ত নূতন বঙ্গ ভাষার প্রবর্তন করেন। এঁরা নিজেদের লেখা বই-পুস্তকে বৌদ্ধ-মুসলিম-পর্তুগিয-প্রবর্তিত সুপ্রচলিত শব্দসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। ...বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া দাবি এই যুগেই শুরু হয়। 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও 'ব্যাকরণ মঞ্জুষা' লেখা হয় এই সময়ে বাংলাকে সংস্কৃতের খাতে ফেলিবার উদ্দেশ্যে। খাওয়াকে 'আহার করা' পরাকে 'পরিধান করা' বসাকে 'উপবেশন করা' ইত্যাদি সংস্কার শুরু হয় খুবই দ্রুত গতিতেই। নদীয়াবাসী প্রতিভাবান সংস্কৃত পণ্ডিতদের শক্তিশালী লেখনী-মুখ বাংলা ভাষা যে সাহিত্যিক রূপ পায়, তার শব্দ প্রয়োগে বাক্য বিন্যাসে নদীয়ার বাকরীতি ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিষ্টা লাভ করে। সাময়িকভাবে বাংলা ভাষা সত্যসত্যই সংস্কৃতের পালিতা কন্যা হইয়া য়ায়। ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলা পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়।"[১খ]

১৭৭৮ সালে লিখিত হেলহেড সাহেবের (যদিও তিনিও সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম কান্ডারী) মন্তব্য পাঠে উপরোক্ত বিদেশী পন্ডিতদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। তিনি লিখেছিলেন, "Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity; when it could borrow Shanscrit terms for every circumstances without the danger of becoming unintelligeble, and when tyranny had not yet attemhted to impose its fetters on the freedom of composition ...how far the Modern Bengalees have been forced to debase the Purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers ...[who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears such of the persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and termination."[২]

সুলতান ও নবাবি আমলে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা, তখন মৌলবীর সুবিধা পেয়েছেন তাদের ফারসি জ্ঞানের দরুণ। ব্রাহ্মণরাও শিখেছিলেন সেই ভাষা। রামমোহন চমৎকার ফারসি জানতেন। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এদের পিতা ফারসিতে দক্ষ ছিলেন এবং এরা যে ব্যাতিক্রম ছিলেন তা নয়। নিয়মের মধ্যেই পড়তেন, কিন্তু তবুও শ্রেণীগত নৈকট্যের ভেতরে সম্প্রদায়গত দূরত্বের একটা বোধ ছিল বৈ কি। সেই বোধটাই সক্রিয় হয়ে উঠল যখন ইংরেজরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এল। ক্ষমতার নতুন অধিকারীরা যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই মুসলিম শাসকদের সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ

মনোভাব গড়ে তুলবে এটা স্বাভাবিক ছিল না। গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসকরা চেষ্টাও করেনি। বরং মুসলিম শাসনামলে হিন্দু মধ্যবিত্ত কেমন অনাচার ক্লিষ্ট ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ছিল সেটা মনে করিয়ে দিয়ে এই শ্রেণীকে ইংরেজরা নিজেদের কাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ওই শাসকদের প্রশ্রয়ে চরিতার্থতার সুযোগ পেয়ে বেশ স্ফীত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে এর প্রভাব কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে বেশ প্রকটভাবে দেখা দেয়।

ভাষায় যে সংস্কৃতায়ণ ঘটেছিল তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল এক 'অপূর্ব মুসলমানী' ভাষা। কথাটা খুব সত্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যের সৃষ্টি করল কিনা সে সম্পর্কে এখানে কোনো মতামত দেওয়া সঙ্গত হবে না।" আসলে মতামত দেওযা খুবই সঙ্গত ছিল। সবাই মিলে তা দিলে কে জানে হয়তো ঘটনার গতি সেই সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখে ধাবিত হত না। আর সেটা হয়নি বলেই বাঙালি জাতির জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এটা স্বীকার করেছেন যে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতায়ণ ভাষার শক্তি তো বৃদ্ধি করেইনি বরং জাতি হিসেবে বাঙালিকে দুর্বল করে ফেলেছে। খুবই খাঁটি কথা। অবশ্যই দুর্বল করেছে, কেননা তা সাহায্য করেছে বাঙালিকে বিভক্ত করতে।

ভাষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা কেবল শব্দ নিয়ে গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি, বিশেষ বিশেষ শব্দ নিয়ে প্রচন্ড কলহের জন্ম পর্যন্ত দিয়েছে। যেমন রক্ত অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। এই বিশেষ কলহটা সৃষ্টি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়, ওই শব্দটির (কবিতার লাইনটি ছিল—'উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুর্নবার।' 'বাঙ্গালার কথা' নামের কোনও একটি পত্রিকায় নাকি ওই আপত্তির কথা ছাপা হয়েছিল) ব্যবহার নিয়ে। হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯২৭ সালে ১৩ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌখিক ভাষণে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে যে সমালোচনা করেছিলেন, নজরুল নিজেকে তার লক্ষ্য বিবেচনা (ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রমথ চৌধুরির বক্তব্য : রবীন্দ্রনাথ কোন উদীয়মান তরুন কবির নবীন ভাষার উদাহরণ স্বরূপ 'খুন'-র কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি বিশেষ করে নজরুলের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি—'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা', আত্মশক্তি পত্রিকা, ২০ মাঘ, ১৩৩৪) করে লেখেন 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' শীর্ষক প্রবন্ধ। নজরুল ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলেন : "...আজকের 'বাংলার কথা'-য় দেখলাম কবি গুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি। কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি পায়জামা ব্যবহার করেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে। এই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন। ...'খুন' আমি ব্যবহার করেছি আমার কবিতায় মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। ...আমি

শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি আরোও অনেক আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। ...বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরও খুবসুরতই দেখায়। ...তাছাড়া যে খুনের জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে ...খুন করা, খুন হওয়া ইত্যাদি। ...হৃদয়েরও খুন-খারাবী হতে দেখি আজো।"[৩]

নজরুলের খুন শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাছে সঠিক বলে মনে হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, "হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি...।"[৪] বিশ্বকবির এমন মত নিয়ে তর্ক চলতে পারে, যেমন আবুল ফজল লিখেছিলেন, "রাজশেখর বাবুর চলন্তিকায় 'খুন চড়া' শব্দটিও দেখলাম এবং তিনি তার অর্থ দিয়েছেন, 'ক্রোধে রক্ত গরম হওয়া।' ...রক্ত অর্থে খুন শব্দটি আমাদের অভিধানে স্থান পেয়েছে।"৫ উল্লেখ্য, ৩১-৮-৪০ তারিখে আবুজ ফজল তাঁর ৩টি গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতামতের জন্যে। সেই সূত্রেই তিনি লিখেছিলেন, 'গল্পগ্রন্থ দুটিতে বঙ্গের পূর্ব সীমান্তবাসী মুসলমান সমাজ ও পরিবার জীবনের কিছু কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে, ফলে তাদের মুখের ও জীবনের সাহিত্যে এখনো অপ্রচলিত বহু শব্দ ও প্রকাশভঙ্গিমা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আমার বিশ্বাস মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে গেলেই এরকম বহু অপ্রচলিত শব্দ বাংলা ভাষাকে হজম করতেই হবে।" আবুল ফজল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, 'মুসলমান নায়িকা মুসলমান নায়ককে দস্তরখানা বিছিয়ে নাস্তা পরিবেশন করছে, অনেক ভেবেও এ বাক্যটি বিশুদ্ধ বাংলায় পরিবর্তিত করতে তিনি পারেননি। কারণ 'দস্তরখানা' কোনও প্রতিশব্দ বাংলায় নেই এবং জোর করে করতে গেলে তা কৃত্রিম শোনাবে। এবং মুসলমান জীবনের সত্য ছবিও তাতে ধরা পড়বে না।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ (০৬-০৯-১৩৪০) বলেন, "ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অর্কমণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানী করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করবে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে এই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েল্‌স আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজি ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটেনের ঐ সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয় মহলে ঐ সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজি ভাষা তাঁদের

সাহিত্যের ভাষা ঐ শব্দগুলো তার আসরে জবরদস্তি করতে পারে না। এইজন্যেই ঐ সাধারণ ভাষা আপনি নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। খুন-খারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করেনি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে এই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে, তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। ...মুসলমান...জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতঃই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বল বৃদ্ধি হবে...।"

অথচ, বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন তার পাতা উল্টে গেলে দেখা মিলবে 'খুন'-র। ১২৮৭ সালে লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় 'পাখিটি মরিলে কাঁদিয়া খুন' বলায় দস্যু রাজা বাল্মীকির প্রতি দস্যুদের অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল।

যাই হোক, প্রয়োগ প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বিতর্কটি বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, দেশ বা সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করলে উল্টো ফলই ঘটবে। অপরদিকে বন্দে আলি মিয়ার 'ময়নামতীর চর' কাব্যে পরিচিত প্রাদেশিক শব্দসমূহ ব্যবহার করায় কবি খুশি হয়েছিলেন।

বাংলায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার এবং তার জটিলতা নিয়ে কবি ১১ই চৈত্র ১৩৪০-এ এম এ আজমকে এক পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি প্রবাসীতে (পৌষ, ১৩৪২) 'ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয় : "...ভাষা মাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যান্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকে তারা ইংরেজি ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টামাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তাহলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ্ লেখক, স্কচ্ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন, কিন্তু সেটাকে স্পষ্টতঃ স্কচ্ ভাষারই নমুনা স্বরূপ স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ্ ও ওয়েল্‌স ইংরেজের সঙ্গে এক-নেশানের অন্তর্গত।

আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশে ব্রিটিশে ব্ল্যাক্ এণ্ড ট্যান নামক বীভৎস খুনো-খুনির ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেনি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরেজি ব্যবহার করেছেন যে অবিমিশ্র ইংরেজিই।

ইংরেজিতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত Jungle– সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না। ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসি আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে—আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা নিস্ফল।

উর্দু ভাষায় পারসি ও আরবি শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশাল চলেছে—স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেনীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা-মা শব্দের বদলে পাপা-মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাদেরকেও অর্থাৎ বাঙালী য়ুরেশীয়কে আমরা দুরে রাখার অন্যায় বোধ করি। খুশী হবো তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে উঠে তবে এর অভিসম্পাদ আমাদের সভ্যতার মূল্যে আঘাত করিবে।"[৬] আসলে রবীন্দ্রনাথ অকারণে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দী বা যেকোন বিদেশী শব্দকে বাংলায় ব্যবহার করা ভাষার সৌন্দয্যের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি জোর করে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের এমন প্রয়োগ বিশেষ করে প্রয়োজনকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গণ্য করতেন।

বস্তুত বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত কারণে এবং সর্বোপরি ইসলাম সাহিত্য গঠনের প্রযোজনে বাংলা ভাষায় কিছু পরিমাণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের আনয়ন প্রয়োজন। ১৯২৬ সালের ৬ই আগষ্ট বাংলার মুসলমান সমাজের কৃষ্টি ও সাহিত্য চিন্তার কর্ণধার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি কলকাতার এম. এল. জুবিলি ইনষ্টিটিউসনে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় আবেদন রেখেছিলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আরবি ও ফারসি শব্দবহুল বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দেয়।[৭] এই সমিতি পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে ২০শে আগষ্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত আর একটি সভায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে যে বাংলার মুসলমানের ভাষা বাংলার হিন্দুর ভাষা থেকে পৃথক এবং যেসব ব্যক্তি বা মহল ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক তারা অবশ্যই মুসলিম বাংলাভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে।[৮] ১৯৩৫ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে তৎকালীন বাংলার

মুসলমান সমাজের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী কাজী মজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মোহাম্মাদ হাবিবুল্লা, আবদুল কাদির, মুজিবর রহমান, শামসুননাহার, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ একই বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং সার্থক মুসলিম সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় কিছু আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ দরকার তা তারা উল্লেখ করেন।[৯] এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবার সুসাহিত্যিক ও সমালোচক এস. ওয়াজেদ আলির মত ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইসলামি শব্দের বাংলাভাষায় সঠিক উচ্চারণের জন্য তিনি বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে উর্দু বর্ণমালার কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করতেও চেয়েছিলেন।[১০] বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যেমন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরি বা কাজী আনোয়ারুল কাদির (যারা শিখা গোষ্ঠী নামে পরিচিত) ইত্যাদি আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ চাননি বা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ পরিবর্তনের পরিপন্থীও ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল—বাংলা ভাষায় পরিবর্তন না করে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র যদি প্রকৃত ইসলামী চিন্তা ও ভাব আনা যায় তবেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য গড়ে উঠবে।

একথা ঠিক যে, কাজী নজরুলের আগে কোনও বাঙালি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাফল্য ও সার্থকতার সঙ্গে আরবি, ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য কিছু সীমিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সার্থক হোক বা অসার্থক হোক বাঙালি মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি বা উর্দু শব্দের প্রয়োগে খানিকটা অনাবশ্যক প্রচেষ্টা আবশ্যম্ভাবীরূপে সমকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল যাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। [১১]

১৩৩৯ সনের প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায়[১২] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত 'মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা-২য় ভাগ' ও মোহম্মদ মোবারক আলি প্রণীত 'মক্তব মাদ্রাসা সাহিত্য-১ম ভাগ' নামক শিশু পাঠ্যপুস্তক দুটির সমালোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের নাম ছিল 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা'। রমেশচন্দ্র এই দুই পুস্তকের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অকারণে এই দুই লেখক কিছু অপ্রচলিত আরবি, ফারসি শব্দ প্রায় জোরপূর্বক এই শিশু পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়েছেন এবং বাধ্য হয়েছেন এই শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিতে যাতে শিশুরা এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারে। এই লেখাতে আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কিছু শব্দার্থের যে বিবরণ ছিল তার কয়েকটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—প্রদীপ = চেরাগ, ধার্মিক = দীনদার, স্বপ্ন = খাব, বিদ্যা = এলেম, সৃষ্টি = পয়দা, আশ্রয় = পানাহ, নিষ্পাপ = বেগুনাহ, কৃতজ্ঞতা = শোকর গুজারি ইত্যাদি। রমেশচন্দ্র এই দুই মনোবৃত্তির পিছনে মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ এবং প্যান-ইসলামিজমের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে সাবধান করে বলেছেন, 'শুনা যায় ঢাকা সেকেণ্ডারী বোর্ড মুসলমানি বাংলায় লিখিত পুস্তক সকল ছাত্রের জন্যই অবশ্য পাঠ্য করিতেছেন, বাঙালি সাবধান।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায়[১৪] ওই প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, সহজভাবে বাংলা ভাষায় আগত ফারসি যেমন—হাজার, মেজাজ, বেচারা, নেশাখোর, বদমায়েস শব্দ বদল করবার কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু 'শিশু পাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবিআনা, পারসিআনা করাটাকেই আচার নিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুল পাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসি বা আরবি ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন?' ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মৌলবী ছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসি-আরবি জড়ানো, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা বলে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় যাঁদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে, তাঁরা ঘরে যে ইংরেজি বলেন, সকলেই জানেন সেটা আন্‌ডিফাইল্‌ড, আদর্শ ইংরেজি নয়—স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ছেলেদের জন্যে সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাঁদের অসম্মান হবে, তবে সে বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না।"[১৫]

স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্টি সচেতন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী তাঁদের চেষ্টার এই সমালোচনাকে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদস্বরূপ প্রথম সারির নেতা ও সাহিত্যসেবী আকরাম খাঁ তাঁর নিজের পরিচালিত মোহাম্মদীতে 'মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে[১৬] এই আরবি-ফারসিয়ানার স্বপক্ষে এক জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানের বিশিষ্ট ভাব ও সংস্কার রক্ষার জন্য, হিন্দুর সঙ্গে 'কালচারগত' পার্থক্য রক্ষার জন্য কতকগুলি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজনীয়। আকরাম খাঁর চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি শোনা যায় আইনজীবী সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলির 'গুলিস্তা'য় প্রকাশিত নিবন্ধে।[১৭] এই নিবন্ধে ওয়াজেদ আলি শুধু যে মাত্র রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন তা নয়, খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে মুসলমানের জাতীয় আত্মার বা কালচারের সঙ্গে আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষা ঘনিষ্ঠ এবং সেই জাতীয় আত্মার সম্যক প্রকাশের জন্য যতটা আরবি, ফারসি এবং উর্দু শব্দের এবং ভাবের আমদানী করা দরকার ততটাই সে করবেই, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাও এর জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। ছোট, বড়, মাঝারি মাপের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। শনিবারের চিঠি, বসুমতী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাময়িক পত্র-পত্রিকা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদে।

আসলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখ বিভিন্ন প্রকৃতির, তবে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার রকমফের সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ করে জাতি বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল। 'রূপরেখা' পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে আলতাফ চৌধুরির একটি পত্র পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৭ই বৈশাখ ১৩৪১ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অকল্যাণ প্রসঙ্গে লেখেন : "রূপরেখায় তোমার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ, আনন্দ পেয়েছি। আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে

না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায়নি। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এতবড় স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জাবোধ করি। বাংলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালী বলে গণ্য না করতুম তাহলে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ-প্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না করে উপায় কী? বেলজিয়ামে জনাসাধারণের মধ্যে একদল ফ্লেমিশ, অন্যদল ফরাসী, ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসী ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানে দুই সমাজের বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিম সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব নেই। সে সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি করে উর্দু ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসঙ্গতভাবে মিশেল করতে থাকবেন তাঁদের কাছে থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে।"[১৮]

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ আলতাফ চৌধুরিকে দুঃখ জানিয়ে লিখেছিলেন, "এরকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহ পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে?"

প্রসঙ্গেক্রমে বলে রাখি, কর্মজীবনের প্রথমে উইলিয়াম কেরী যখন দিনাজপুরে ছিলেন তখন স্থানীয় লোকদের ভাষা ছিল একটি নয়, দুটি। ব্রাহ্মণরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটি বাংলা আর অন্যরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি হলো বাংলা, হিন্দুস্থানী, ফারসি ইত্যাদির একটি মিশ্রণ। এই দ্বিতীয় ভাষাটি মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের।[১৯] কিন্তু ওই দুই ভাষার ব্যবধান তখন সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয়নি, সেটা নিল পরে, মুসলিম সমাজে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তখন।'আবারও স্মরণ করা যাক যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে দুই দিকের দুই মধ্যবিত্তের একটি বৈষয়িক সংগ্রাম, যে সংগ্রামে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে একটি সুবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে। ফলে দুই পক্ষের মৌলবাদীরা চেষ্টা করেছে শব্দের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে।

তবে এটা ঠিক যে, শব্দ নিজে নিজে কিন্তু সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে না। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনও শব্দকে যখন বিশেষ অর্থে বা অনুষঙ্গযুক্ত করে ব্যবহার করে, তখনই তা সাম্প্রদায়িক পরিচয় লাভ করে। শব্দের স্বরূপ, উদ্ভব, বিকাশ যেদিক থেকেই আলোচনা করা যাক, শব্দ সব সময় সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। তাকে সম্প্রদায়ের রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়

মাত্র। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "...আমাদের পন্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল একেবারে আপামর সাধারণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। 'কলম' মুসলমানি শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে 'লেখনী' শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ 'লেখনীর' অর্থ উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। 'কলম' ও 'লেখনী' দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। 'দোয়াত' মুসলমানি কথা। 'দোয়াত' লেখা যাইবে না, 'মস্যাধার' লিখিতে হইবে। 'পাট্টা' মুসলমানি কথা। পাট্টা লিখিবেন না, 'ভোগবিধায়ক পত্র' লিখিবেন। 'আদালত' লিখিবেন না, লিখিবেন—বিচারালয়'। এইরূপে তাঁহারা বাংলাকে শুদ্ধ বা মার্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনোই সফল হইবার নয়।"

আবুল মনসুর আহমদের মতে, অবশ্য শব্দ আসলে হিন্দু বা মুসলমান কোনটাই হয় না। ঐতিহাসিক কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই তা ধর্মীয় চরিত্র পরিগ্রহ করে। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে এই বক্তব্যে : "আমি বলি না যে, গোশতের বদলে 'মাংস', আন্ডার বদলে 'ডিম' এমন কি পানির বদলে 'জল' বলা চলিবে না। বরঞ্চ আমার মত এই যে, এইগুলি সমার্থবোধক বাংলা প্রতিশব্দ। সাহিত্যে উভয় শব্দই ব্যবহার করা হইবে প্রয়োজন মতো। কিন্তু এর একটা 'ছাড়িয়া' আরেকটা 'ধরিতে' যাওয়াতেই আমার যত আপত্তি। ...প্রথমত, 'ছাড়া' 'ধরার' মধ্যে একটা হীনমন্যতা ও পরাজিতের মনোভাব লুকাইয়া আছে। উপরের শব্দ-জোড়াগুলির মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথাও যেমন বলা যায় না, একটা মুসলমানের অপরটা হিন্দুর একথাও বলা যায় না। আসলে কোনও শব্দেরই ধর্মীয় কোনও রূপ নাই। জোড়ার প্রতিশব্দগুলিও তেমনি ইসলাম-বিরোধী বা হিন্দুয়ানীও নয়।"[২০]

কিন্তু ধর্মীয় রূপ না থাকলেও আবুল মনসুর আহমেদ মনে করেন, সব ভাষাতেই অনেক এমনকী বেশিরভাগ শব্দেরই একটি একটি কৃষ্টিগত রূপ থাকে। 'গোশ্‌ত', 'আন্ডা' ও 'পানি'-র মধ্যে ইসলামত্ব নেই বটে তবে মুসলমানত্ব আছে। শব্দ বা ভাষার এই কৃষ্টিগত রূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আবুল মনসুর আহমদ আরও বলেছেন, "সুতরাং আমরা যদি পানি ছাড়িয়া জল ধরি তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইব না সত্য। কিন্তু ঐতিহ্যচুত হইব নিশ্চয়ই। এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে।"[২১]

পানি বাংলাভাষী বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা। ঘটনাচক্রে তাদের বেশীরভাগই মুসলমান। কিন্তু বাঙালি হিন্দু ছাড়া ভারতের প্রায় সব মানুষই পানি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য সাঁওতালরা পানি বা জলকে নিজ ভাষায় 'দাঃ' বলে থাকেন, তেলেগু ভাষায় 'নীলু' বলা হয়। এছাড়া কানাড়ি, মালয়ালম, তামিল ইত্যাদি ভাষায় পানি বলা হয় না। কোথাও 'নীরু' ভেল্লম ইত্যাদি বলা হয়। তবে অসমিয়া, উড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, ভোজপুরি, হিন্দি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরী, মৈথিলী, পোস্তু, নেপালী ইত্যাদি

সমস্ত ভাষাতেই পানি শব্দ কথ্য ও লেখ্যরূপে ভারতীয় সাহিত্য-কাব্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পানির ভারতীয়তার ওপর আরও খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। ভারতে মুসলিম অভিযানের বহু পূর্বের ইতিহাস। গুপ্তযুগের কথা। প্রতাপশালী গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে বরাহ ও তার পুত্র মিহির ছিলেন অন্যতম। মিহিরের পত্নী গুণবতী খনা। খনার পান্ডিত্য আজও লোকের মুখে মুখে। বাংলা সাহিত্যের এবং ভারতীয় কৃষি ও গৃহ-বিজ্ঞানের মূল্যবান সম্পদরূপে খনার বচনগুলি যেমন শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে, তেমনি হিন্দুদের আচারে-বিচারে ও দৈনন্দিন জীবনধারার নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কৃষি-সংক্রান্ত খনার বচনগুলির মধ্যে আমরা পানি ব্যবহারের সন্ধান পেয়েছি। 'কৃষিগাথা' নামক পুরনো বই থেকে আমরা ওই সন্ধান উদ্ধার করছি—'খনা বলে শুনহ স্বামী/ শ্রাবণ ভাদর নাহিক পাণি/ দিনে জল রাতে তারা/ এই দেখবে দুঃখের ধারা।'

উল্লেখ্য, সমালোচকদের দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুপ্তযুগের ইতিহাসের আলোকে খনা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় প্রারম্ভিক কালের মহিলা। তাছাড়া 'পানি' শব্দ বাংলায় আদি গ্রন্থ চর্যাপদে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আগে বৈদিক সংস্কৃতে 'পানি' (প্রাচীন বানান পাণী) অর্থে 'অপ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, জল ব্যবহৃত হয়নি। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমত ও নাথপন্থীমত খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী কি তারও পূর্বে চলিত ছিল। সহজিয়া নাথপন্থীমত-প্রচারী একটি হেঁয়ালি চর্যার রেখাচিত্র উদ্ধার করেছেন সুকুমার সেন। তাতে আমরা 'পাণী'-র রূপ দেখতে পাই। হু-বহু-চর্যা-চিত্রটি তুলে ধরলাম— 'গঙ্গা যমুনা মাঝেরে বহই নাই/ তহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইয়া লীলে পার করেই।/ বাহ তু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা/ সদগুরু-পাঅপসা ত্র যাইব পুনু জিনউরা।/ পাঞ্চ কেড়ায়াল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী/ গঅন-দুখোলো সিঞ্চহুঁ পাণী পই সই সান্ধি।"[২২]

রামাই পন্ডিতের শূণ্য পুরাণে (একাদশ দশকে), প্রাচীন লোক গাথা, ছড়া, শিব-চন্ডীর পাঁচালি ইত্যাদিতেও 'পানি' শব্দের উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবসাহিত্য বাংলার সাহিত্য মহাসাগর। এতে 'পানি' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বৈষ্ণব-সাধক কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে জ্ঞানদাস কৃষ্ণপ্রেম গেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমপ্রেমে রাধা অভিমানক্ষুব্ধা। এই প্রেমে তেলজলের গরমিল রয়েছে। এই উপমায় জ্ঞানদাস 'পানি' গ্রহণ করেছেন প্রায় তিনশো বছর আগে। যেমন— 'অন্তর বাহির সমানহ রীতি।/ পানি তেল নহ গাঢ় পিরাতী।'[২৩] পদকর্তা গোবিন্দ দাস তাঁর 'রসোদগার'-এ শ্রীরাধিকার জবানীতে 'পানি' ব্যবহার করেছেন।[২৪]

১৬শ শতকের গৌড়বঙ্গে মঙ্গলকাব্যের বান ডেকেছিল। সেগুলি রচিত হয়েছিল রাঢ়বঙ্গের বাংলা ভাষায়। সে যুগের কাব্য কৌশলের কবীন্দ্র ছিলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কন উপাধিপ্রাপ্ত এই কবি ছিলেন বর্ধমান-মেদিনীপুর মৃৎখণ্ডের খাস বাঙালি। তিনি রচনা করে গেছেন 'অভয়ামঙ্গল' বা 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য। তিনি তাঁর এই বিখ্যাত কাব্যে অত্যন্ত

অসঙ্কোচে অন্তত চল্লিশ জায়গায় 'পানী' শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, এবং সে ব্যবহার আজকের সাহিত্যিক বিচারেও স্থানসঙ্গত ও অর্থসঙ্গত হয়েছে; মর্মগামী সৌন্দর্যের সম্ভারও তাতে যেন কথা কয়ে উঠেছে।

শব্দকোষকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে পানি শব্দ ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্য কর্মের নামি-দামি কর্ম থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

'তীর্থ বারনসীর পানি'—(শূণ্য পুরাণ)
'পাণী'—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরাখন্ড)
'জোয়ারের পাণি, নারীর যৌবন'—(চন্ডীদাস)
'পাণি ফোঁটা'—(ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী)
'যেন মেঘে মেঘে পাণী পসালা'—(কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)
'চক্ষে বহে পাণি'—(কাশীদাসী মহাভারত)
'যৌবন রাধে পাণির ফোটা'—(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
'আহার পাণি নিদ্রা রহিত'—(চৈতন্যভাগবত)

বাঙালির প্রতিদিনের জীবনের কথ্য ভাষায় বহু শব্দে, প্রবচনে পানি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পানিফল, পানিকৌড়ি, জলপানি, পানিবসন্ত, পানিশঙ্খ, পানিকাক, কালাপানি, পানিসার, পানিশিউলি, পানিকচু, পানিডুবুরি, পাণিগ্রহণ, পানভূত, পানপচা, পানমশলা, পানসে, পান্তা, প্রভৃতি। স্থান নামে পানিহাটি, পানিতর ইত্যাদি। প্রবাদ প্রবচনে 'ধরি মাছ না ছুই পানি', 'মেঘ চাইতে পানি, খোদার মেহেরবানি' ইত্যাদি। আরও রয়েছে—'পানি পানি মুখ' (বিবর্ণ-ফ্যাকাশে), 'বিষ পাণি হওয়া', 'আগুনে পানিপড়ী' প্রভৃতি।

'পানি'-র পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-কর্মে 'জল' শব্দও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন খনার বচনে—"দিনে জল রাতে তারা/এই দেখবে দুঃখের ধারা।" চর্যাগীতিতে সাধারণভাবে 'পানি' ব্যবহৃত হলেও 'জল' সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়—"মুক্কউ চিত্ত গজেন্দ করু এহ বিঅপু নু পুচ্চ/ নআন গিরি নইজল পি ত্র উ তিহুঁ তড় বসউ সইচ্ছ।" শূণ্য পুরাণে 'জল'-র উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়—"জল খাইয়া স্নান করেন ধর্ম আগাম জলে।/ অখন্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"জলে পসি তপ করে নীল উৎপল।" (তাম্বুল খন্ড) মঙ্গলকাব্যে—"আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ ডুবিল, মাঝে মাঝে উড়িল ধূলা।/সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই, ডুবিল দেউল চূড়া।" চৈতন্যভাগবতে—"জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।/ তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষুদ তোর জল।" দশরথি রায়ের পাঁচালি—"কর্ণে প্রবেশিল জল, জল দিলে জল বারি হয় লো ধ্বনি।"

পানির মত জলও বাংলা শব্দভান্ডারের বহু শব্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমান। যেমন—জলসার, জলচর, জলসত্র, জলপাণি, জলকর, জলপ্রপাত, জলযোগ, জলযান, জলবায়ু, জলমগ্ন, জলাশয়, জলাতঙ্ক, জলাঞ্জলি, জলো, জলসম ইত্যাদি।[২৫]

সে যাই হোক, সংস্কৃত থেকে জাত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও কথ্য স্তরে পানি শব্দ একসময়ে সার্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এটাও বোধ হয় জানা যে, 'জল' যেমন সংস্কৃত উৎসের, তৎসম শব্দ;'পানি'-ও তেমনি সংস্কৃত উৎসের, তবে তদভব। 'পানীয়', থেকে পানি। তা না জেনেই এক শ্রেনীর হিন্দু বাঙালি 'পানি'-র উপর বিদ্বেষ নিয়ে বসে থাকেন। 'যবন' স্পর্শদোষে পানিকে যেন কুল হারাতে হল। কিন্তু অভিধানে যখন এই বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই তখন দুঃখ হয় বৈকি! একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বেশীর ভাগ হিন্দু অভিধান-প্রণেতার অভিধানেই জল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'বারি' 'সলিল' ইত্যাদি শব্দের দেখা পাওয়া গেলেও 'পানি' কথাটির দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে। এটা অচেতন নয়, সচেতন বর্জন—এটাই বিপদের কারণ। মুসলিম শাসকরা চৌদ্দঘাটের পানি পান করে বাংলায় এসেছিলেন, তাই তাদের উত্তরসূরীরাও পানি দখল করলেন আর সেই দুঃখে হিন্দুরা পানি ছেড়ে জল ধরলেন।

'দেশ'-এর এক পত্রলেখক জন্মজিত রায় বাংলা ভাষায় জল শব্দের ব্যাপক প্রচলনের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, "আধুনিক বাংলায় 'পানি' শব্দ বন্ধ হওয়ার কারণ রেনেসাঁস বাংলায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের হাতে বাংলা ভায়ায় Standardisation. অবশ্য এর আগে চৈতন্যযুগেই এটা হতে শুরু করেছে তৎসম শব্দ ব্যবহারের জন্য। নবযুগের বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন ও সাহিত্যিক রূপ দান করতে গিয়ে বাংলা ভাষার স্থপতিবৃন্দ অনিবার্যবশত 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। ...দ্বিতীয় কথা, বাংলা ভাষা রেনেসাঁসি যুগে তৎসম শব্দ দিয়ে সমৃদ্ধ হতে গিয়ে অনেকগুলি দেশজ ও তদভব শব্দকে বর্জন করেছে। 'পানি' এরকম একটি শব্দ।"[২৬]

কিন্তু বিষয়টি যে এত সরল নয় তা বলা বাহুল্য। বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রে পানি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে জলে উত্তরিত হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। কিন্তু কেন সংস্কৃত শব্দ পানি থেকে বাঙালি হিন্দুর এই মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রবণতা? এর সুত্রপাত শুর ও সেন যুগ থেকে। এই যুগে নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গৌড়-বঙ্গের স্থানীয় সংখ্যাগুরু পরাজিত বৌদ্ধদের প্রতি শুরু হল বিদ্বেষভাব, ঘৃণা আর তার সাথে যুক্ত হল বৌদ্ধদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সচেতন ব্রাহ্মণ্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটল পার্থক্য নির্ণয়কারী বিশেষ বিশেষ শব্দ গ্রহণ-বর্জনে, বাংলায় সংস্কৃত থেকে জন্ম প্রাকৃত ভাষায় নতুন করে সংস্কৃতরূপ প্রকরণে এবং বিশেষ বিশেষ আচরণে। এই পর্যায়েই ব্রাহ্মণ ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে 'পানি' ছেড়ে 'জল' বলার প্রবণতা শুরু হয়।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে নিগৃহীত ও অপমানিত বৌদ্ধরা তুর্কি ও আফগান শাসনকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে আহত ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বের ঘৃণাভাব নব মুসলিমদের প্রতি আরও বেড়ে গেল আর সেই অনুপাতে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে পানি ছেড়ে জল বলার প্রবণতা বেড়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদী শুর ও সেন যুগে যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল, তুর্কি-আফগান যুগে তা গতিপ্রাপ্ত হয়ে কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র 'পানি' শব্দ থেকে যুগপৎভাবে ও

আধাআধিভাগে জল-পানির ব্যবহারে এসে পৌঁছাল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতে, এ সময়কার সমস্ত সাহিত্য কর্মে তাই জল-পানির যুগবৎ অবস্থান। ইংরেজ আমলে এসে ইংরেজ অনুসৃত ভেদনীতির দরুণ এ প্রবণতার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটল। ঈশ্বর গুপ্তে এসে বাঙালি হিন্দুর শব্দভান্ডারে জল শব্দ প্রায় সার্বজনীনতা পেল। দ্বিধা বিভক্ত বাঙালি সমাজের অবশিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বের প্রভাবে পানির বদলে জল শব্দকে গ্রহণ করে নিল। যদিও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালি হিন্দুরা (বিশেষত নিম্নবর্ণের) পানিই বলতে থাকল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলায় যে সমস্ত অঞ্চলের নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সেই সমস্ত অঞ্চলে আদি বাঙালি সমাজের রীতিনীতি চালচলন আজও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান আছে আর এই সমস্ত অঞ্চলের (যেমন শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম) বাঙালি হিন্দুরা আজও পানি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও সম্ভবত শেষবারের মত পানি শব্দের প্রয়োগ করলেন দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে। আসলে "বৌদ্ধগণ মুন্ডিত মস্তক ছিলেন, এ জন্যই তাঁহারা উত্তরকালে হিন্দুগণ কর্তৃক 'নেড়া' নামে অভিহিত হইযাছিলেন। বৌদ্ধগণের অনেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওযার পর উক্তনামে বঙ্গীয় মুসলমানগণও পরিচিত হইয়া থাকেন।"২৭ আর নেড়া বা নেড়ে বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হওযা মানুষের শব্দাবলীতে পানি শব্দই থেকে গেল। এ তো গেল 'পানি' থেকে জলে উত্তরণের ইতিহাস।

মুল প্রসঙ্গে আসি, 'পয়ঃ' ধাতু থেকে পানীয় আর পানীয় থেকে পানি (যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে), যা সারা ভারতের হিন্দুরা পান করে থাকেন, কী কারণে বাঙালি মুসলিমদের পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গেল তা ভেবে পায় না। 'পানি' সংস্কৃত জাত হলেও সাধারণ মুসলমানের ওই শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি নেই। কিন্তু সংস্কৃতজাত 'জল'-এ যত আপত্তি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে জলযুক্ত সকল শব্দকেই কাফেরের স্পর্শদোষে দুষ্টু মনে করা হত। 'জলপানি'-র মত (ছাত্রবৃত্তি) স্মৃতিধন্য শব্দ ও 'জলকুন্তল'-র মত মনমুগ্ধকর শব্দটি ছিল মৌলবাদীদের কাছে 'নাপাক'। 'জলখাবার' তো বলাই যাবে না। বলতে হবে 'নাশতা'। সৈয়দ আলাওল যদিও 'জলসত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ময়মনসিং গীতিকায় আছে, 'বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর'। এখন সম্ভবত পানিটুঙ্গীর ঘর বলে পড়তে হবে। পানিবসন্ত হলেও হিন্দুরা জলবসন্তই বলবে। যদিও 'ঠান্ডা ঠান্ডা পানিফল' তারা খায় বৈকি! 'পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় উটনা—উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে। সত্যেন্দ্রনাথের 'চুপচুপ ওই ডুব দ্যায় পানকৌটি' এখনও শ্রুতিদুষ্ট নয় কারও কাছেই।

সাম্প্রদায়িক অনুমোদনের ফলে ঐতিহ্যলুপ্ত আর একটি শব্দ হল 'আন্ডা'। ঈশ্বরগুপ্ত চেয়েছিলেন, 'গন্ডা গন্ডা এন্ডা খেয়ে ঠান্ডা করি প্রাণ'। অনেকেরই মনের কথা এটি। উভয়বঙ্গের অভিধানেই বলা হয়েছে 'আন্ডা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'অন্ড' থেকে। তাই বলে কোনও হিন্দু বাঙালি খাবার দোকানে গিয়ে আন্ডার ওমলেট চাইবেন না। আন্ডার ওমলেট চাইলে বুঝতে হবে লোকটি অবশ্যই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ক্রেতা ডিমের

ওমলেট চাইলে বুঝতে হবে লোকটি অবশ্যই হিন্দু। ডিম শব্দটিরও উদ্ভব সংস্কৃত 'ডিম্ব' হতে। অথচ উৎস একই হলেও 'ডিম' আর 'আন্ডা'তে যেন দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে।

আবার ধরুন: কাকা, বাবা। বাংলা অভিধানে এদের উৎস খুঁজতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। শব্দ দুটি তুর্কি। বাংলায় (গৌড়) তুর্কি শাসনকালে ঢুকেছিল। মজার কথা, বাঙালি মুসলিমরা তুর্কি কাকা নেননি, হিন্দ চাচা নিয়েছিলেন। হিন্দির 'চাচা' আবার সংস্কৃতজ (সং-তাত < চাচ < চাচা)। হিন্দুরা তুর্কি 'কাকা' নেন (অনেকের মতে কাকা ফারসি শব্দ)। বাঙালি হিন্দুরা 'বাবা'ও নেন। অনেক বাঙালি হিন্দু জাত্যাভিমানবশত দাবি করে থাকেন যে, 'বাবা' শব্দ সংস্কৃত 'বপ্র' বা 'বপ্ত' থেকে উদ্ভুত হয়েছে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। সংস্কৃত বপ্র > বপ্প > বাপ-এ পরিণত হয়েছে। বাঙালি মুসলিমরাই পিতাকে তা বলে থাকে।

তাছাড়া মুসলিমরা আরবি 'আবু'-জাত অপভ্রংশ শব্দ 'আব্বা'-ও নেন (পিতাকে বোঝাতে)। অবাঙালি হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দিভাষীরা দাদা/দাদি নিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলিমরাও নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, দাদা/দাদি ফারসি শব্দ। তবে শব্দ দুটির সঙ্গে তুর্কি-আফগান অভিযানের সম্ভবত কোনও সম্পর্ক নেই। এগুলো পূর্ব থেকে প্রচলিত ইন্দো-ইরানীয় শব্দ মাত্র। তুর্কি-আফগান অভিযানের বহু আগে থেকে ভারতের বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বহু ফারসি শব্দ বিভিন্ন কারণে গৃহীত হয়েছে। পৃথকীকরণের তাগিদেই বাঙালি হিন্দু প্রযোগের ক্ষেত্রে শব্দের আকৃতির কিছু পরিমার্জন বা পরিবর্তন করে অথবা সামান্য ভিন্নার্থে শব্দগুলিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বাঙালি হিন্দুর 'দাদু' শব্দও ফারসি (ফারসি দাদা শব্দের আদরের সংক্ষিপ্ত রূপ—যেমন মামা > মামু, কালা > কালু, কাকা > কাকু, দাদা > দাদু)। বাঙালি হিন্দুরা দাদুকে ঠাকুরদাও বলেন। এই ঠাকুর শব্দটিও তুর্কিজাত। তুর্কি Tagri মানে ঈশ্বর, দেবতার ইত্যাদি। তবে শ্বদটি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অপভ্রংশ বা বিকৃত উচ্চারণে ঠাকুর / ঠক্কর / থ্যাকারে ইত্যাদি হয়ে যায়। কোনও প্রাচীন প্রাকমুসলিম যুগের সংস্কৃত গ্রন্থে ঠক্কর বা ঠাকুর শব্দ নেই। সেই সঙ্গে 'বু' শব্দ/ধ্বনি সংস্কৃত ভগ্নী শব্দের রূপান্তরিত রূপ। আদরে দ্বিত্ব হয়ে তা 'বুবু' হয়েছে— বু > বুন > বোন > বহিন > ভইন > ভগিনী > ভগ্নী। কিন্তু বাঙালি হিন্দু-এর প্রতিশব্দ হিসেবে যে শ্বদটি ব্যবহার করে, সেই 'দিদি' শব্দটি ফারসি। এই বুবু/দিদির প্রতিশব্দ 'আপা' ও কিন্তু বিদেশী শব্দ—তুর্কি, যা বাঙালি মুসলিমদের কেউ কেউ ব্যবহার করে। শব্দকোষকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নানা' (মায়ের বাবা) শব্দকে দেশজ মুন্ডারী (অষ্ট্রিক) বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তর ভারতের সংস্কৃতের সন্তান বলে চিহ্নিত সব ভাষা-ভাষী মানুষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাঙালি মুসলিমরা মায়ের বাবাকে 'নানা'-ই বলে। বাঙালি হিন্দুই এ বিষয়ে ব্যতিক্রমী।

আবার ফুপা/ফুপী (পিসা/পিসী-সংস্কৃত) শব্দও দেশীয়। আর 'জী' শব্দও সংস্কৃত থেকে এসেছে। জী > আজ্জী > আজ্জ > আর্য। প্রবীণ, বয়স্ক, সম্মাণীয় বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 'জী' শব্দের ব্যবহার, যেমন—নেহরুজী। এছাড়া সম্বোধনে সাড়া দিতেও 'জী' শব্দ ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে বাঙালি হিন্দু ব্যতিক্রমধর্মী আজ্ঞে (সং) বলে সাড়া

দেয়। তাছাড়া বাপের সাথে 'জী' যোগ করলে বাপজী মুসলিম আর বাপুজী হিন্দু -মুসলিম সকলের বাবা জাতির জনক। বাবাজী কিন্তু জাতের বালাই ঘুচিয়ে হিন্দু-মুসলিম সকলের জামাই। আবার জ্যেষ্ঠ মানে বড় আর ভ্রাতা মানে ভাই। কেউ যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা না বলে বড় ভাই বলেন তা হলে তিনি মুসলিম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাদা হলেন কোন আইনে তা জানা নেই।

বস্তুত যুগ যুগ ধরে বাইরের উৎস থেকে যে সমস্ত নৃ-গোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসে এদেশকে নিজেদের করে নিয়েছে, তারা তাদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু না কিছু অবশেষ নিজের নাম ও পদবির মধ্যে সংরক্ষিত করেছে অথবা এ বিষয়ে অপরকে প্রভাবিত করেছে কিংবা নিজেরাও প্রভাবিত হয়েছে। একমাত্র অস্ট্রিক বলে বর্তমানে চিহ্নিত 'কোল মুন্ডারি' মানুষেরাই ভারতের আদিম অধিবাসী। আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতিসত্তা অথবা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষরা সব বহিরাগত।

প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে বলতে চাই বাংলা ভাষায় অন্য বহু ভাষার শব্দ মিশেছে, আজও ব্যবহৃত হচ্ছে—সে সবই বাংলা ভাষা। এত কথা বলতে হল বড় দুঃখে। সাধারণ মানুষের দোষ লাভ নেই। দোষ ছিল 'অসাধারণ মানুষ অর্থাৎ শিক্ষিত উচুঁ গদিওয়ালা চেয়ারে বসা মানুষদের'। নেই কাজ তো খই ভাজ-এর মত গোটা কতক শব্দের জাত বিচার করে এবং শব্দ দিয়ে জাতের বিচার করে ওরা শিক্ষা ও জগৎটাকে কুস্তির আখড়ায় পরিণত করেছিলেন। 'শব্দ' দূষণ হলে Polution Board আছে, কিন্তু শব্দ (Words) নিয়ে পরিবেশ দুষিত হলে তার সমাধান কী হবে? তবে যারা হিন্দুয়ানি বাংলা আর মুসলমানী বাংলা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা ঠিক করুন কোনটি রাখবেন, না দুটোই রাখবেন। কেননা বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোত চলমান কোনও শব্দকে মুসলমানী শব্দ, হিন্দুয়ানি শব্দ, খ্রিষ্টান শব্দ বলে চিহ্নিত করার মৌলবাদী ভাবনা যেন কারও মনে স্থান না পায়।

তথ্যসূত্র :

১. উদ্ধৃত -পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ-১৭৬।

১ক. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ-৪৫।

১খ. আবুল মনসুর আহমদ, পাক বাংলার কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢা, ১৯৬৬, পৃ-১২১-২২।

২. N. B. Halhed, A Grammar of the Bengal Language, P 207-212; দ্র: সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ-৪৫-৪৬।

৩. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলি, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ-৩২৭।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, কলকাতা, পৃ-৩০৫-৩০৬।

৫. আবুল ফজল, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ-২৮।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা', প্রবাসী, পৌষ ১৩৪২।

৭. দ্য মুসলমান, ১৩ই আগষ্ট ১৯২৬।

৮. দ্য মুসলমান, ২৩শে আগষ্ট ১৯২৬।

৯. স্টার অফ ইণ্ডিয়া, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।
১০. এস. ওয়াজেদ আলি, বাংলা বর্ণমালা, সাহিত্যিক, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৪, পৃ-৩২৭-৩৩৮।
১১. ধূর্জটিপ্রসাদ দে, সম্প্রদায়ের সাহিত্য না সাহিত্যের সম্প্রদায়—বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক বাংলার একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রশ্ন, ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, কলকাতা, পৃ-৩৯৪-৯৫।
১২. প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১ম খন্ড, বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ-১৪৪-৪৭।
১৩. রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা, প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ১ম খন্ড, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ-৬০২।
১৪. প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ১ম খন্ড, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ-৬০১-৬০২।
১৫. প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ১ম খন্ড, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ-৬০২।
১৬. মোহাম্মদী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।
১৭. এস. ওয়াজেদ আলি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও মক্তব মাদ্রাসা বাংলা শিক্ষা, গুলিস্তা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, পৃ-৩০-৩৬।
১৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ-৫৩৬-৩৭।
১৯. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ-৮০।
২০. আবুল মনসুর আহমদ, পাক বাংলার কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ-২২৮-২২৯।
২১. আবুল মনসুর আহমদ, পাক বাংলার কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ-২২৯।
২২. সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ-৩৫-৩৬।
২৩. বিশ্ববাণী, আশ্বিন ১৩৭৫, পৃ-৪৩৩।
২৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা কার্তিক ১৩৭৬, রবিবার।
২৫. মহম্মদ আমীর হোসেন, বাঙালির জল-পানি, শারদীয় অনুষ্টুপ, ১৯৯৭, কলকাতা।
২৬. দেশ, ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৪, কলকাতা।
২৭. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ-৫৯১।